লকডাউন অর্থনীতি

পার্থপ্রতিম মুখোপাধ্যায়

লকডাউনের সময়সীমা ক্রমশ বাড়ছে। পাশাপাশি, তুলনায় কম সংক্রমিত অঞ্চল পাচ্ছে কিছু ছাড়। সংক্রমণের নিবিড়তার নিরিখে এলাকাগুলি রেড, অরেঞ্জ ও গ্রিন নামে শ্রেণিবিন্যস্ত। রেড এলাকার মধ্যেও সংক্রমণের বেশি-কম বিভেদে এ, বি, সি ইত্যাদি অঞ্চল চিহ্নিত হচ্ছে, চিহ্নিত হচ্ছে সর্বাপেক্ষা সংক্রমিত অঞ্চল ‘কনটেনমেন্ট জোন’ যেখানে লকডাউনের নিয়মকানুন কঠোরতম। এই শ্রেণিবিন্যাস ক্ষণস্থায়ী। সংক্রমণের হারের হ্রাস-বৃদ্ধির ফলে রেড জোন হয়ে যেতে পারে অরেঞ্জ বা গ্রিন জোন কিংবা, গ্রিন জোন হয়ে উঠতে পারে অরেঞ্জ বা রেড জোন। একইভাবে রেড জোনের এ, বি, সি প্রজ্ঞাপনও বদলাতে পারে। ঘটছেও তা-ই। যতদিন ভাইরাসের প্রতিষেধক আবিষ্কৃত না হয়, নিয়মকানুন পালনে শিথিলতা দেখা দিলে সংক্রমণবৃদ্ধি স্বাভাবিক।

প্রতিষেধকের বিষয়ে বিভিন্ন দেশে গবেষণা চলছে। কোনটা কবে সফল হবে, মানুষের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য গণ্য হবে কেউ নিশ্চিত বলতে পারছেন না। যখন হবে, প্রশ্ন ওঠে কীভাবে তার উৎপাদন হবে ও সারা বিশ্বে বণ্টিত হবে। যদি প্রতিষেধক বিদেশে আবিষ্কৃত হয়, ভারতে কবে কীভাবে পৌঁছবে? যদি ভারতেই এমন প্রতিষেধক উদ্ভাবিত হয়, কেয়াবাত। বিদেশে বা ভারতে যেখানেই প্রতিষেধকটি উদ্ভাবিত হোক, তা ভারতের জনসংখ্যার পরিপ্রেক্ষিতে কবে কীভাবে প্রতিটি মানুষের কাছে পৌঁছবে?

এই ক’টি প্রশ্নই আমাদের এনে ফেলে সটান অর্থনীতির আঙিনায়। ওঠে কিছু অর্থনৈতিক প্রশ্ন – ১) গবেষণায় প্রয়োজনীয় অর্থ কে কীভাবে জোগাচ্ছে বা জোগাবে? ২) প্রতিষেধকের ফরমুলার পেটেন্টের রীতিনীতি কী হবে? প্রতিটি দেশ ও সংস্থাকে তা কি কিনতে হবে? কী দামে? ৩) উৎপাদনের উপাদানগুলির জোগান-উৎস কী? ৪) কোথায় ক’টি সংস্থা উৎপাদন করবে? ৫) কী পরিমাণে উৎপাদন করবে? ৬) দাম কী হবে? – সব ক’টি প্রশ্নই ধরে নেয় বিশ্বে তথা দেশে অর্থনীতি সচল। বস্তুত, সচল অর্থনীতি ছাড়া প্রশ্নগুলির প্রাসঙ্গিকতাই নেই। তাহলে, প্রতিষেধকের প্রসঙ্গ থেকেই প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠল অর্থনীতি তথা অর্থনৈতিক জঙ্গমতা।

ভারতের মতো ভৌগোলিক আয়তনে বৃহৎ এবং জনসংখ্যায় বিপুল দেশে প্রতিটি মানুষের জন্য প্রতিষেধক উপলভ্য করতে গেলে তার উৎপাদন হওয়া প্রয়োজন বিস্তর এবং দাম তথা ব্যয় হওয়া উচিত নগণ্য। নির্দিষ্ট পরিকল্পনা, উচ্চ উৎপাদনশীলতা, অ্যাসেম্বলি লাইন উৎপাদন, এককথায় অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড বিনা এই লক্ষ্যপূরণ অসম্ভব।

সংক্ষেপে, প্রতিষেধক উদ্ভাবিত হওয়া এবং মানুষের কাছে পৌঁছনোর আগে দীর্ঘ ভবিষ্যতের মুখে দাঁড়িয়ে আমরা। এই সময়ে করোনা থাকবে। সে নিয়েই বাঁচতে হবে। সচল অর্থনীতি ছাড়া বাঁচা সম্ভব নয়। বড় গোলমাল! প্রতিষেধকহীন পরিস্থিতিতে করোনার সঙ্গে যুদ্ধে সম্বল মূলত লকডাউন ও তৎসংক্রান্ত নীতি-নিয়ম। অথচ, সেসব মানলে অর্থনীতি সচল হয় না।

তাহলে, এক) বাঁচা এবং সচল অর্থনীতির মধ্যে সম্পর্কটি সরাসরি; দুই) বাঁচা ও সংক্রমণ ঠেকানোর সম্পর্কটি সরাসরি; তিন) সংক্রমণ ঠেকানো ও লকডাউনের সম্পর্কটিও সরাসরি কিন্তু, চার) লকডাউন ও অর্থনীতির গতির মধ্যে সম্পর্কটি বিপ্রতীপ। কী করা!

মজ্‌ঝিম পন্থা। দ্য মিড্‌ল ওয়ে। কিছু ছাড়, কিছু হার এবং কিছু উদ্ধার। “In the long history of humankind (and, animal kind too) those who learned to collaborate and improvise most effectively have prevailed.” – উক্তিটি চালানো হয় চার্লস ডারউইনের নামে যদিও এমন প্রমাণ নেই যে, ডারউইন স্বয়ং লাইনগুলি কোথাও লিখেছেন বা আওড়েছেন। বাক্যটি যিনিই গঠন ও উপস্থাপন করে থাকুন, হয়তো ডারউইনের বক্তব্যের এক সারসংক্ষেপ হিসেবেই করেছেন। মোটের উপর, বাক্যটি প্রণিধানযোগ্য। বিশেষত দুটি শব্দ – ইমপ্রোভাইজ। কোলাবরেট। পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে চলতি পন্থায় নতুন মাত্রা যোগ করা এবং সহযোগিতা।

অনির্দিষ্ট কাল সার্বিক লকডাউন চালানো কোনও দেশ, সরকার, কোনও সমাজের পক্ষেই সম্ভব নয়। চালালে, সংক্রমণ নিয়ন্ত্রিত থাকতে পারে, কিন্তু মানুষ অনাহারে, বিনা চিকিৎসায় অন্যান্য রোগে, আহার্য সংগ্রহের তাড়নায় দাঙ্গায়, ... বহু কারণে মারা যাবে। নিয়ম কিছু শিথিল করতেই হবে। কিন্তু, সম্পূর্ণ শিথিলও করা যাবে না। বরং, বেশিরভাগ নিয়মই যেমন, পারস্পরিক শারীরিক দূরত্ব বজায় রাখা, মুখোশ পরে কাজ করা, বিশুদ্ধক ব্যবহার করা ও অন্যান্য প্রাসঙ্গিক স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলা অত্যাবশ্যক। পাশাপাশি, যে এলাকায় সংক্রমণ বাড়বে সেই এলাকায় তৎক্ষণাৎ কঠোর লকডাউন বিধি পালন করতে হবে, অন্তত কিছুদিনের জন্য। আংশিক ও আবর্তক লকডাউনের

মধ্যেই অর্থনীতিকে যথাসম্ভব পূর্ণমাত্রায় চালু করতে হবে এবং চালু রাখতে হবে। জীবনযাপনের ক্ষেত্রে করোনা-পূর্ব পরিস্থিতিকে যদি স্বাভাবিক ধরে নিই, তবে সেই পরিস্থিতিতে অদূর ভবিষতে ফিরে যাওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু, অর্থনৈতিক সূচকের নিরিখে করোনা-পূর্ব পরিস্থিতি ফিরে পাওয়া প্রয়োজন। ক্রমশ, অর্থনৈতিক উন্নতি ও উন্নয়নের প্রয়োজনে সামগ্রিক বৃদ্ধির হার ঊর্ধ্বগামী হওয়াও প্রয়োজন। এটাই করোনার সঙ্গে অর্থনীতির যুদ্ধ।

অর্থনীতিতে বিশুদ্ধ বা অবিমিশ্র প্রাপ্তি কিছু নেই। কিছু পেতে গেলে কিছু ছাড়তে হয় – এটাই অর্থনীতির ভিত। সবাইকে সমান খুশি করা অর্থনীতির কাজ নয়, সম্ভবও নয়। জগতের সমস্ত সমস্যার উৎস অর্থনীতি নয়। সমস্ত সমস্যার সমাধানসূত্রও অর্থনীতিতে নেই। আলোচনা অতএব অর্থনীতির সীমিত পারঙ্গমতার পরিধিতেই সীমাবদ্ধ থাকবে।

অর্থনীতির প্রাথমিক পর্যায়ের পাঠ্যক্রমের প্রথম দিকেই সম্ভাব্য উৎপাদন সীমা (Production Possibility Frontier) নামে একটি ধারণা আয়ত্ত করতে হয়। সহজ কথায়, বর্তমান প্রযুক্তির নিরিখে দেশের ব্যবহার্য উপাদানগুলির বিভিন্ন সমন্বয়ে কতটা উৎপাদন সম্ভব তা এই ধারণার মাধ্যমে উপস্থাপন করা যায়। যদি উপাদানগুলি কমে যায় কিংবা, কোনও কারণে সম্পূর্ণ ব্যবহার করা সম্ভব না হয় তাহলে উৎপাদনের সম্ভাবনাও কমে। করোনা-কেন্দ্রিক লকডাউন পরিস্থিতিতে দেশে শ্রমদানকারী মজুত থাকলেও, উৎপাদনক্ষেত্রে শ্রমের জোগান কমে যাচ্ছে। পুঁজির ক্ষেত্রেও, দেশে-বিদেশে মজুত থাকলেও, উৎপাদনক্ষেত্রে বিনিয়োগ কমছে। মোটের উপর, লকডাউনের ফলে উৎপাদনক্ষেত্রে সমস্ত উপাদানের ব্যবহারই বিপুল মাত্রায় কমে আসছে। ফলত, সম্ভাব্য উৎপাদন সীমাও অস্বাভাবিক সংকুচিত হবে। পরিণতি, উৎপাদন হ্রাস পাওয়া। মনে রাখতে হবে, উৎপাদনবৃদ্ধি হ্রাস পাওয়া নয়, বলা হচ্ছে উৎপাদন হ্রাস পাওয়ার কথা। ফলে, এক্ষেত্রে, উৎপাদনবৃদ্ধি তথা অর্থনৈতিক বৃদ্ধির হার ঋণাত্মক দাঁড়ালে তা হবে স্বাভাবিক ফলশ্রুতি। বিশেষজ্ঞরা আশঙ্কা করছেন, এই পরিস্থিতি অব্যাহত থাকলে, চলতি অর্থবর্ষে এবং আগামী বছরগুলিতে ভারতের তো বটেই, সারা বিশ্বের প্রায় সমস্ত দেশের অর্থনৈতিক বৃদ্ধির হার দাঁড়াবে ঋণাত্মক। ইতিমধ্যেই, ২০২০ সালের প্রথম চতুর্মাসিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্থূল অভ্যন্তরীন উৎপাদনবৃদ্ধির হার দাঁড়িয়েছে -৪.৮ শতাংশে এবং ভারতের ক্ষেত্রে শূন্য শতাংশে। ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাংকের গভর্নর আশঙ্কা করছেন ২০২০ সাল শেষ হতে হতে এই হার ভারতেও ঋণাত্মক দাঁড়াবে। ফল, ব্যবহার্য দ্রব্য ও সেবার পরিমাণ কমবে। সেক্ষেত্রে, মাথাপিছু আয় তথা মাথাপিছু

ব্যবহার্য দ্রব্য ও সেবার পরিমাণও কমবে। দেশ গরিব হবে, মানুষ গরিব হবে, গরিব আরও গরিব হবে।

আসা যাক পুঁজির প্রসঙ্গে। দেশ আরও গরিব হলে, আয় কমলে, ক্রয়ক্ষমতা কমলে, পণ্যের চাহিদা কমবে। পণ্যের দাম কমা উচিত, অবিক্রিত পণ্যের পরিমাণ বাড়া উচিত। অবিক্রিত পণ্যের পরিমাণ বাড়বে। কিন্তু, দেশের ভয়ানক আয়বৈষম্যের কারণে দাম কমবে না। বরং, বাড়বে। বর্ধিত দামের ফলে উৎপাদনকারী, তা তিনি সংগঠিত ক্ষেত্রের বৃহৎ শিল্পপতি হোন কি অসংগঠিত ক্ষেত্রের অতিক্ষুদ্র মালিক, লাভবান হবেন না। সাময়িক লাভ পকেটে পুরবেন কতিপয় মধ্যবর্তী ব্যবসায়ী। আর যদি উৎপাদনকারীর মুনাফা বাড়েও, সংকুচিত চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি বিনিয়োগ বাড়াবেন না। বরং, কমাবেন। বিনিয়োগ কমার ফলে কর্মীছাঁটাই আরও বাড়বে, আয় আরও কমবে, ক্রয়ক্ষমতা আরও কমবে, বাজারে চাহিদা আরও কমবে, বিনিয়োগ আরও কমবে ... অর্থনীতি বন্দি হবে এক দুষ্টচক্রে।

ধরা যাক, দেশের বেশিরভাগ উৎপাদনী ক্ষেত্র এবং পুঁজি রাষ্ট্রায়ত্ত হল। সরকার সমস্ত অধিগ্রহণ করল। মুনাফার কথা না ভেবেই এখন সরকারি উদ্যোগে বিনিয়োগ হবে। সরকারি উদ্যোগের বিভিন্ন বহুচর্চিত সমালোচনাগুলির উল্লেখ আপাতত না হয় বাদই থাক। সরকারি পুঁজি বিনিয়োগের মাধ্যমে উৎপাদন চালু রাখতে গেলেও প্রয়োজন লকডাউনকে উপেক্ষা করা বা, লকডাউনের নিয়ম শিথিল করা। সুতরাং, উদ্যোগ সরকারি হোক কি বেসরকারি, অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড চালু রাখতে লকডাউন শিথিল করা ছাড়া উপায় নেই। প্রশ্ন হল কতদূর?

এতদূর নিশ্চয় নয় যেখানে মানুষের জীবন নিশ্চিত বিপন্ন হবে। কর্মক্ষেত্রে শারীরিক দূরত্বের বিধি পালন করতে হবে। মুখোশ ব্যবহার করতে হবে অর্থাৎ, মুখোশের উৎপাদন বাড়াতে হবে। নিয়মিত বিশুদ্ধকের ব্যবহার করতে হবে। কর্মক্ষেত্র নিয়মিত শুদ্ধিকরণ করতে হবে – বিশুদ্ধকের উৎপাদন বাড়াতে হবে। স্বাস্থ্যব্যবস্থা ও পরিকাঠামো উন্নততর ও বিস্তৃততর করতে হবে – হাসপাতাল, ডাক্তার, নার্স, ওষুধপত্র, যন্ত্রপাতি, সবেরই উৎপাদন বাড়াতে হবে। ভাল। এর জন্য প্রয়োজন উৎপাদন, কর্মচারী, পুঁজি। প্রয়োজন আরও হাসপাতাল এবং ডাক্তারি ও নার্সিংয়ে পড়ুয়াদের পঠনপাঠন চালু রাখা। ভবিষ্যতের ডাক্তার-নার্সরা এখন স্কুল-কলেজের পড়ুয়া। সার্বিক শিক্ষাব্যবস্থা চালু থাকা আবশ্যিক।

সকলের অর্থনৈতিক স্বার্থের কথা ভাবলে, সবাইকেই কর্মের সুযোগ দেওয়া উচিত। এই প্রসঙ্গে ভাবা যাক কর্মক্ষেত্রে শারীরিক দূরত্ব বজায় রাখার বিধিটির কথা। বিধি মেনে কারখানার সমস্ত শ্রমিককে কারখানা চত্বরে আনতে গেলে চত্বরটি বাড়ানো দরকার। যন্ত্রপাতির অবস্থানও তদনুরূপ হওয়া উচিত। এর জন্য কারখানার প্রয়োজন আরও জমি, উপযুক্ত পরিকল্পনা এবং কারখানার নতুন নকশা। প্রয়োজন পুঁজি।

সীমিত পরিসরের কারণে যদি সকল কর্মচারীকে কর্মক্ষেত্রে আনা না যায়, তাহলে যাদের আনা গেল না তাদের ভরণপোষণের ব্যবস্থা প্রয়োজন। লাগে অর্থ। বিশেষ করে অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিকদের সপরিবার ন্যূনতম জীবনযাপন নিশ্চিত করতে সকলেই প্রস্তাব করছেন কিছু সরকারি মদত। এই মদত বা উদ্যোগের সংস্থানের সম্ভাবনা তো বটেই, উপর্যুক্ত সমস্ত ক্ষেত্রেই সরকারি ও বেসরকারি বিনিয়োগের সম্ভাবনা ক্রমশ কমে আসছে। যত দিন যাবে, এই সম্ভাবনা আরও কমবে এবং একসময় সমস্তটাই হয়তো অসম্ভব হয়ে পড়বে।

মনে রাখতে হবে, বর্তমান সরকারি ব্যয়ের বেশিটাই সংগঠিত হচ্ছে পূর্ববর্তী আয় (মূলত কর আদায়)-এর ভিত্তিতে। বর্তমান অর্থবর্ষে যদি সরকারের আয় বিশেষত কর আদায় কমে, কমছে তো বটেই, পরবর্তী অর্থবর্ষে সরকারের ব্যয় করার সামর্থ্যও কমবে এবং তৎপরবর্তী অর্থবর্ষে আরও কমবে এবং, তৎপরবর্তী অর্থবর্ষে ...। সুতরাং, অর্থনৈতিক কাজকর্ম, সোজা কথায় কাজকর্ম, শুরু করতে হবে।

ভারতের মতো দেশের কিছু অতিরিক্ত বিশেষত্ব আছে। এক) জনসংখ্যা। জনঘনত্ব। এখানে সারা দেশ মানে বিপুল সংখ্যক মানুষ। কর্মক্ষেত্রের, তা সে কারখানা হোক কি আরকিছু, আয়তন বাড়ানোর মতো জমি কতটা উপলভ্য তা রীতিমতো মাথাব্যথার বিষয়; দুই) অর্থনৈতিক বৈষম্য। কোনও সরকারি উদ্যোগ কিংবা, নীতি ভারতের মতো দেশের মানুষদের সকলকে একভাবে প্রভাবিত করে না; তিন) সরকারি প্রকল্পে দুর্নীতি। কোনও প্রকল্পেরই বরাদ্দ অর্থ সবটা টারগেট গ্রুপের কাছে পৌঁছয় না। বেশিটাই খেয়ে নেন মন্ত্রী, সাংসদ, বিধায়ক, কাউন্সিলর, পঞ্চায়েত সদস্য প্রমুখ রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, ঠিকাদার এবং সরকারি কর্মচারী এদের একাংশ; চার) রাজনীতি। এমনও হয় যে, ত্রাণ বিলির ক্ষেত্রেও উদ্যোগী মানুষ বা সংস্থাকে শাসক দল কাজ করতে দেন না। করতে চাইলে তাঁদের অনুমতিসাপেক্ষে বা, অনেক ক্ষেত্রে তাঁদের মাধ্যমে তা করতে হয়; পাঁচ) বিরোধী দলগুলিও ভোটের রাজনীতিই করেন। এককথায়, ভারতের মতো দেশে করোনা-কেন্দ্রিক

অর্থনীতির বিষয়ে পরিকল্পনা বিশেষভাবে সদিচ্ছা, মনোযোগ ও উদ্যোগ দাবী করে। প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে কোলাবরেট করা।

ভারতে মোট কর্মী ও শ্রমিকের সংখ্যা ৫৫ কোটি ৫৯ লক্ষ। এর ১০ শতাংশেরও কম নিযুক্ত সংগঠিত অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে। অথচ, মোট জাতীয় আয়ে এই ক্ষেত্রটির অবদান প্রায় পঞ্চাশ শতাংশ। অন্যদিকে, অসংগঠিত ক্ষেত্রে নিযুক্ত ৫২ কোটি ১৯ লক্ষ অর্থাৎ ৯০ শতাংশেরও বেশি। জাতীয় আয়ে এই ক্ষেত্রটির অবদান পঞ্চাশ শতাংশের কিছু বেশি। সংগঠিত ক্ষেত্র প্রবলভাবে পুঁজিনিবিড় এবং অসংগঠিত ক্ষেত্র ততটাই শ্রমনিবিড়। বৃহৎ শিল্প সমস্তই সংগঠিত ক্ষেত্রে। অসংগঠিত ক্ষেত্রে বিপুল উপস্থিতি অতিক্ষুদ্র এবং কুটির শিল্পের। প্রশ্ন হল, ভারতের মতো দেশে করোনা আক্রমণের পরিপ্রেক্ষিতে কী ধরণের অর্থনৈতিক কৌশল গ্রহণ করা উচিত?

তৎক্ষণাৎ মনে হয়, গৃহবন্দি হয়েই যখন থাকতে হবে, অসংগঠিত ক্ষেত্রের কুটির ও অতিক্ষুদ্র শিল্পকে অগ্রাধিকার দেওয়াই ভাল। কতটা ভাল? অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিকদের পঞ্চাশ শতাংশেরও বেশি নিযুক্ত কৃষিক্ষেত্রে। জাতীয় আয়ে কৃষিক্ষেত্রের অবদান মোটামুটি ১৫ শতাংশ। সেক্ষেত্রে, জাতীয় আয়ে বাকি অসংগঠিত ক্ষেত্রের অবদান দাঁড়ায় ৩৫ শতাংশের কাছাকাছি। দেশে বর্তমানে কৃষিপ্রযুক্তি ব্যবহারের নিরিখে বলা যায়, কৃষিক্ষেত্রে নিযুক্ত মানুষদের বড় অংশ সেখান থেকে সরিয়ে নিলে কৃষি উৎপাদন সম্ভবত কমবে। কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদনশীলতা বাড়ানোর আগে এই পদক্ষেপ গ্রহণ করা যাবে না। তাহলে হিসাবমতো অসংগঠিত ক্ষেত্রে বাকি থাকেন সেই ক্ষেত্রের ৫০ শতাংশ শ্রমিক অর্থাৎ, প্রায় ২৬ কোটি মানুষ। এরা উৎপাদন করেন জাতীয় উৎপাদনের ৩৫ শতাংশ। স্পষ্টত, সংগঠিত ক্ষেত্রের বৃহৎ শিল্পকে বন্ধ রাখলে, এদের পক্ষে জাতীয় উৎপাদনের বাকি ৫০ শতাংশ উৎপাদন-ক্ষয় পূরণ করা সম্ভব নয়।

অতিক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের এক-একটি ইউনিটে কর্মীসংখ্যা কম হওয়ার কারণে সেখানে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা তুলনায় সহজ মনে হয়। ফলত, করোনার সংক্রমণও কম হওয়ার কথা। কিন্তু, এক) এই শিল্পের ইউনিটগুলিতে যে পরিসরে মানুষ কাজ করেন তা কতটা স্বাস্থ্যকর ভাবনার বিষয়; দুই) শুধু উৎপাদন হলেই হবে না। উৎপাদিত পণ্যকে বাজারে নিয়ে যেতে হবে। এই ক্ষেত্রটি যেহেতু অসংগঠিত, বিকেন্দ্রিত এবং এক-একটি ইউনিটের উৎপাদনক্ষমতা যেহেতু সীমিত, বিপুল পরিবহনকাঠামো, অসংখ্য ছোট পণ্যবাহী গাড়ি এবং অগণন মানুষের যোগদান ছাড়া এই ক্ষেত্রের উৎপাদিত পণ্য বাজারে পৌঁছনো সম্ভব নয়। অর্থাৎ, এই প্রশস্ত পথে করোনার আগমন

বরং আরও দ্রুত ঘটতে পারে; তিন) মানুষের ব্যবহার্য সব ধরণের পণ্য, এমনকী সমস্ত দৈনন্দিন ব্যবহার্য পণ্যও অসংগঠিত ক্ষেত্রের পক্ষে উৎপাদন করা সম্ভব নয়; চার) জাতীয় আয়ের ৫০ শতাংশ আসে অসংগঠিত ক্ষেত্র থেকে। অথচ, এখানে দেশের ৯০ শতাংশেরও বেশি শ্রমিক নিযুক্ত। অর্থাৎ, এই ক্ষেত্রে শ্রমিকের উৎপাদনশীলতা কম। সুতরাং, দ্রব্য ও সেবা এই ক্ষেত্রে উৎপাদনের জন্য সময় দিতে হবে বেশি, জোগান হবে স্তিমিত এবং ফলত পণ্যের দামও হবে বেশি। অসংগঠিত ক্ষেত্রের মানুষ নিজেই সেই পণ্য খরিদ করতে পারবেন না।

অসংগঠিত ক্ষেত্রের জন্য উপযুক্ত অর্থনৈতিক ও প্রযুক্তিগত পরিকল্পনার প্রয়োজন আছে। সরকারের তরফে এই ক্ষেত্রটির জন্য জোরালো সহায়তা ও সমর্থন প্রয়োজন। অর্থনৈতিক বৈষম্যের প্রকট প্রতিফলন দেখা যায় সংগঠিত-অসংগঠিত বৈষম্যের মধ্যে। এই বৈষম্য আজকের নয়। এটা থামা দরকার। কমা দরকার। অসংগঠিত ক্ষেত্রের একার পক্ষে যেমন দেশের অর্থনীতির ভার নেওয়া সম্ভব নয়, অসংগঠিত ক্ষেত্রকে বাদ দিয়ে সংগঠিত ক্ষেত্রের অস্তিত্বও টিকিয়ে রাখা সম্ভব নয়। সংগঠিত ক্ষেত্রের পণ্যের জোগানশৃঙ্খল নির্ভরশীল অসংগঠিত ক্ষেত্রের উপর এবং সংগঠিতের বাজার ছড়িয়ে আছে অসংগঠিত ক্ষেত্রেও।

করোনা-কেন্দ্রিক আপৎকালীন পরিস্থিতিতে সরকারের তরফে দরিদ্র মানুষ এবং অসংগঠিত ক্ষেত্রের প্রতি নগণ্য সহায়তার প্রদর্শনী ঘটেছে। তার চেয়েও কম ঘটেছে বাস্তব সহায়তা। প্রায় সমস্ত অর্থনীতিবিদই মানিটারি পলিসির তুলনায় ফিসক্যাল পলিসি অর্থাৎ, সরকারি ব্যয় বাড়ানোর পক্ষে এবং গরিব মানুষের হাতে নগদ অর্থপ্রদানের পক্ষে সওয়াল করেছিলেন। প্রস্তাবগুলি অনুসৃত হয়নি। এই প্রস্তাবগুলি অনুসরণের পথ এবং সময়সীমাও সংকুচিত হয়ে আসছে। জাতীয় আয়বৃদ্ধির হার কমছে শুধু নয়, তা হয়ে উঠতে পারে ঋণাত্মক। জাতীয় আয় কমলে সরকারি আয়ও কমবে এবং ফলত কমবে সরকারের ব্যয় করার ক্ষমতা। বর্তমান সরকারি নীতি কার স্বার্থে গৃহীত বলা মুশকিল। পুঁজিপতি বা তথাকথিত প্রাইভেট কর্পোরেটের স্বার্থে কি? যুক্তি নেই। মানুষ না বাঁচলে, অর্থনীতি গতিশীল না হলে, পুঁজি গড়াবে কোথায়! মুনাফা আসবে কোন পথে! শ্মশানে পুঁজি যতটা অর্থহীন, কর্পোরেটও ততটাই অস্তিত্বহীন। সরকার সম্ভবত বিশ্বের রেটিং এজেন্সিগুলির আশীর্বাদ ও অভিশাপের বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে ভাবছে। বাজেট ঘাটতি বাড়লে, রেটিং এজেন্সিগুলি ঋণগ্রহণযোগ্যতা কমিয়ে দেবে। ভারতে বিদেশি বিনিয়োগ ঘটবে না। তাতে কী এল-গেল! দু-একটি ব্যতিক্রম ছাড়া, দেশীয় পুঁজিপতিরাই বিনিয়োগ গুটিয়ে ফেলছে, বিদেশিরা সরকারি-বেসরকারি কোথায় এখনই বিপুল বিনিয়োগ করবে! সরকারি মন্ত্রকের দৃঢ় সুপরিকল্পিত নীতি

চোখে পড়ে না। মনে হয়, করোনার অভিঘাতে আহত সরকার এখনও শিশুর মতো চকিত দিশাহীন। ভেবে উঠতে পারছে না কর্তব্য। যেন সমস্ত বেশ চলছিল, বেশ আরামে খেলছিলাম, হঠাৎ এ কী দৈবদুর্বিপাক! দৈবের উপরেই সমস্ত সরকারি ভরসা ন্যস্ত সম্ভবত। সত্যিই তো, কোথায় অচ্ছে দিন, কোথায় কৃষকের আয় দ্বিগুণ হবে সেই প্রচারের সোরগোল, আর কোথায় এই করোনা গোলমাল! ডাক ছেড়ে কান্না এখনও শুরু হয়নি। যে পথে সরকার চলেছে, অচিরেই শুরু হবে।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের হাতে আপাতত সুদ কমানো ও টাকা ছাপানো ছাড়া ব্যবহার্য অস্ত্র নেই। আংশিক সরকারি প্রণোদনায়, আংশিক নিজ চেতনার বশে রিজার্ভ ব্যাংক ক্রমাগত সুদ কমিয়ে চলেছে। এর ফল? এক) ঋণগ্রহণ বাড়া উচিত। কীভাবে বাড়বে? জমি, বাড়ি, ভোগ্যদ্রব্য কিনতে কে ঋণ নেবে এখন? দুই) স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে শিল্পপতি, কারবারি-ব্যবসায়ী, বিনিয়োগকারী ঋণ নেয় কারবারের খাতিরে, কারবার বাড়াতে। দেশে পুঁজির আকাল দেখা দেয়নি। পরিস্থিতিবশত বিনিয়োগ ঘটছে না। সুদ কমিয়ে লাভ? এখন কারবার কোথায় যে কেউ কারবারি ঋণ নেবে? সে-ই নেবে, যে অর্থ তছরুপ করতে চায়, সুযোগ বুঝে দেউলিয়া করতে চায় ব্যাংককে; তিন) যাদের আয় মূলত সঞ্চয়ের সুদ-নির্ভর, অবসরপ্রাপ্ত প্রবীণরা যেমন, তাঁদের আয় কমবে, ক্রয়ক্ষমতা কমবে। তাঁদের জীবনযাপনে ঘোর সমস্যা উপস্থিত হবে তো বটেই, চলতি চাহিদা সংকোচনে অতিরিক্ত সংকোচন সংযোজিত হবে; চার) কিছু ঋণসৃজনও যদি হয়, নিঃসন্দেহে যার বেশিটাই হবে অনুৎপাদক, মুদ্রাস্ফীতি ঘটবে, পণ্যের দাম বাড়বে। অথচ, বর্তমান চাহিদা ও ভেঙে পড়া জোগানশৃঙ্খলের পরিপ্রেক্ষিতে এই দামবৃদ্ধি মুনাফা ও বিনিয়োগবৃদ্ধির মেকানিজ্‌ম বা কার্যকারণ প্রবাহে চালিত হবে না। বিনিয়োগ বাড়বে না, কর্মসংস্থান ঘটবে না, উৎপাদনও বাড়বে না; পাঁচ) কেইন্‌স ও পরবর্তীকালের অর্থনীতিবিদেরা ব্যাখ্যা করেছেন বর্ধিত মুদ্রাস্ফীতি বর্ধিত করের সঙ্গে তুলনীয়। কারণ, করের হার বাড়লে প্রকৃত আয় কমে। মুদ্রাস্ফীতির ফলেও প্রকৃত আয় কমে। সবচেয়ে গোলমাল হল, যেখানে করের বর্ধিত হার নির্দিষ্ট আয়শ্রেণির মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা যায়, সেখানে মুদ্রাস্ফীতি ধনী-গরিব নির্বিশেষে সবাইকে প্রভাবিত করে, সকলের আয় কমিয়ে দেয়। গরিবের হাতে সামান্য যেটুকু নগদ অর্থ থাকবে তারও প্রকৃত মূল্য কমে যাবে। গরিবের ক্রয়ক্ষমতা আরও কমবে।

শেষপর্যন্ত বাধ্য হয়ে টাকা হয়তো ছাপাবেন সরকার বাহাদুর। ফিসক্যাল পলিসির সরকারি ব্যয়বৃদ্ধির নিয়ম মেনে কিছু প্রকল্পে খয়রাত করবেন, গরিবের হাতে কিছু টাকা পৌঁছবে। হয়তো

বড় দেরি হয়ে যাবে ততদিনে। আয়বৃদ্ধির ঋণাত্মক সিঁড়ি বেয়ে যেখানে দেশ নামবে, ক্রয়যোগ্য পণ্যের সংকুচিত বাজারে প্রবেশ করে ক্রেতা দেখবেন হাতের নগদের ক্রয়ক্ষমতা দুঃখজনকভাবে হ্রাস পেয়েছে। সরকারি ব্যয়বৃদ্ধির ফলে যে বর্ধিত চাহিদা-তরঙ্গ বিনিয়োগ ও উৎপাদনী ক্ষেত্রে প্রভাব ফেলে, লকডাউনের ফলে সেই তরঙ্গ রুদ্ধ থাকবে। অর্থনৈতিক সংকোচনের সেই পর্যায়ে পৌঁছনোর আগেই ব্যবস্থা নেওয়া ভাল। কালক্ষেপ না করে গরিবের হাতে নগদ পৌঁছে দেওয়া তো বটেই, অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডও এখনই প্রায় সর্বস্তরে চালু না করলেই নয়। নইলে, একটা সময় আসবে যখন মানুষ করোনার ভয় উপেক্ষা করে, সমস্ত নিয়ম-নীতি ভেঙে পথে নামবে, খাদ্যসামগ্রী ও অন্যান্য জিনিসের জন্য দাঙ্গা হবে। মৃত্যুর ভয় সকলের আছে। কিন্তু, করোনার আশঙ্কা আর আশু অনাহারে মৃত্যুর মধ্যে তফাতও আছে। প্রবৃত্তিগতভাবে দ্বিতীয় ভয়টা বেশি জোরালো, মানুষকে দিয়ে করাতে পারে না এমন কাজ নেই।

এসে পড়ে সংগঠিত ক্ষেত্রের ভূমিকা। কর্মক্ষেত্রে সে কারখানা হোক কি আরকিছু, প্রবেশের পথে গায়ের তাপমাত্রা মাপা ইত্যাদি স্বাস্থ্যপরীক্ষার ব্যবস্থা রাখা যেতে পারে। মুশকিল হল, এই ভাইরাসের অনেক বাহকের ক্ষেত্রে রোগের চিহ্ন ফুটে উঠতে দেরি লাগে, কারও কারও ক্ষেত্রে কোনও উপসর্গ কখনওই প্রকাশ পায় না। কিন্তু, এদের থেকে অন্যদের সংক্রমণ ঘটতে পারে। এই কারণে, করোনার পরিপ্রেক্ষিতে প্রদত্ত ব্যবস্থাপত্র অনুযায়ী, কর্মীদের উপযুক্ত ব্যক্তিগত নিরাপত্তাদায়ক পোশাক (PPE) পরে কাজ করতে হবে। কোনও জায়গায় বেশি কর্মীর জমায়েত চলবে না। জমায়েত কর্মীদের মধ্যে অন্তত এক মিটার দূরত্ব সর্বদা বজায় রাখতে হবে। কয়েক দিন কাজ করার পর সেই কর্মীদের বিশ্রাম বা নিভৃতবাসে পাঠিয়ে নতুন একদল কর্মীকে কাজে লাগাতে হবে। একধরণের শিফ্‌ট ব্যবস্থা। ফলে, করোনা-পূর্ব পরিস্থিতির তুলনায় এক-এক শিফটে অনেক কম কর্মী নিয়েই কাজ চালু করতে হবে। তাহলে কর্মীর উৎপাদনশীলতা বাড়াতে হবে। প্রতি শিফটে কম সংখ্যক কর্মী ব্যবহার করে সারা দেশের প্রয়োজন মেটাতে হলে, উৎপাদন বাড়াতে হলে, যন্ত্রের ব্যবহার বাড়াতে হবে। এর অর্থ? আরও পুঁজিনিবিড় প্রযুক্তির ব্যবহার। ধনতান্ত্রিক-সমাজতান্ত্রিক নির্বিশেষে সমস্ত অর্থব্যবস্থাতেই এই পদ্ধতিই অবলম্বন করা হবে। পাশাপাশি, কর্মীর মজুরি কমানো চলবে না। কারণ, পারিশ্রমিক কমালে, উৎপাদন তথা জাতীয় আয় বাড়ানোর প্রসঙ্গটাই অর্থহীন হয়ে পড়ে। চাহিদা সংকোচনের বিরুদ্ধে লড়াইও ব্যর্থ হয়।

ভারতের মতো দেশগুলি অনুন্নত কিংবা, উন্নয়নশীল নামে অভিহিত। প্রসঙ্গত, এক) উন্নত দেশগুলি মূলত শীতপ্রধান। অনুন্নত কিংবা, উন্নয়নশীল দেশগুলি বেশিরভাগই গ্রীষ্মপ্রধান; দুই) উন্নত দেশগুলির তুলনায় অনুন্নত বা উন্নয়নশীল দেশগুলির জনসংখ্যা ও জনঘনত্ব অত্যন্ত বেশি। এক নম্বর কারণে পিপিই পরে কারখানা চত্বরে আট ঘণ্টা কাজ করা ভারতের মতো দেশে প্রায় অসম্ভব। সেক্ষেত্রে, কর্মীদের কাজের সময় কমাতে হবে। এই বাবদে ও কারখানা চত্বর আরও সহনীয় করতে বেশকিছু স্বাস্থ্য ও প্রযুক্তিগত ব্যয় করা প্রয়োজন। তাতেও লাগে সংগঠন ও পুঁজি। অথচ, দুই নম্বর কারণে দেশে শ্রমনিবিড় প্রযুক্তি অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক মনে হয় এবং পুঁজিনিবিড় প্রযুক্তিগ্রহণ শুধু বিসদৃশ নয়, অত্যন্ত অন্যায় এবং সত্যি বলতে, অশ্লীল বোধ হয়। কিন্তু, অনেক বলা-কওয়া, অনেক লেখাজোখার পরও এই বাহাত্তর বছরে যখন দেশোপযোগী শ্রমনিবিড় প্রযুক্তি অধরা থাকে, তখন তাকে অসম্ভবই বলতে হয়। করোনার প্রতিষেধক হয়তো আবিষ্কার হবে। কিন্তু, তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাহাত্তর বছরের অধরাকে ধরা! প্রসঙ্গত, তথাকথিত অগ্রসর বা উন্নত দেশগুলির শিল্পায়নের অভিজ্ঞতা পুঁজিনিবিড় প্রযুক্তিকেন্দ্রিক।

শুধু অনুন্নত বা উন্নয়নশীল বা স্বল্পোন্নত নামে নয়, আরও একটা আখ্যায় চেনা হয় আমাদের মতো দেশকে – labour surplus economy। উদ্বৃত্ত শ্রমের দেশ। এটাও কম অশ্লীল নয়। উদ্বৃত্ত শ্রমের দেশ মানে? দেশে শ্রমিকের সংখ্যা এবং তাদের প্রদেয় সম্ভাব্য শ্রমের পরিমাণ প্রয়োজনের তুলনায় বেশি? এভাবে দেখলে, উদ্বৃত্ত শ্রমিকেরা অপ্রয়োজনীয় সুতরাং অনুৎপাদক সুতরাং পরজীবী সুতরাং আগাছার মতো সুতরাং অবাঞ্ছিত ... কিন্তু, সত্যিই কি তাই? শ্রমনিবিড় প্রযুক্তি বলতে কী বোঝায়? না, শ্রম তথা শ্রমিক বেশি, তুলনায় যন্ত্রপাতি তথা পুঁজি কম, এই একটা সংজ্ঞা শুধু নয়, আরও গুরুত্বপূর্ণ কিছু এর মধ্যে থাকে। কী? প্রশ্ন দিয়েই উত্তর খোঁজার চেষ্টা ভাল। প্রযুক্তিটা কীসের? উৎপাদনের। কারা উৎপাদন করছে? মূলত শ্রমিক। শ্রম নিজেই উৎপাদনের এক উপাদান। কীসের সাহায্যে? যন্ত্রপাতি, কাঁচামাল ইত্যাদি বহু উপাদানের মাধ্যমে। কিন্তু, শ্রম তথা শ্রমিক যদি না থাকে, হাজারও উপাদান এনে হাজির করলেও উৎপাদন ঘটবে না। উৎপাদন মানে মূল্য (value) সংযোজন। এই সংযোজন ঘটার ফলে একটি দ্রব্য নির্দিষ্ট ব্যবহারের উপযোগী হয় এবং ভোক্তার উপযোগ (utility)-প্রাপ্তি ঘটে। অর্থাৎ, শ্রমই উৎপাদনী প্রক্রিয়ায় মূল্য সংযোজন করে। প্রযুক্তি শ্রমনিবিড় হোক কি পুঁজিনিবিড়, এই সত্যের ব্যত্যয় হয় না। (মার্ক্সের আগেই বিশেষত, ডেভিড রিকার্ডো এই ব্যাখ্যা করেছেন।) এর ফলে যে বাস্তব উঠে আসে তা বড় কঠোর।

সেই প্রযুক্তিই গৃহীত হওয়ার কথা যাতে শ্রম তথা শ্রমিকের উৎপাদনশীলতা সর্বোচ্চ। পুঁজিনিবিড় প্রযুক্তিকে হারিয়ে গ্রহণযোগ্য হতে গেলে শ্রমনিবিড় প্রযুক্তিতে শ্রমের উৎপাদনশীলতা হতে হবে অন্তত পুঁজিনিবিড় প্রযুক্তিতে শ্রমের উৎপাদনশীলতার সমান। এমনটা ঘটা মুশকিল। আমাদের দেশে যে তা ঘটেনি তা পূর্বে প্রদত্ত তথ্যেই প্রমাণ – দেশের নব্বই শতাংশ শ্রমশক্তি অসংগঠিত ক্ষেত্রে নিযুক্ত এবং জাতীয় আয়ে সেই ক্ষেত্রের অবদান পঞ্চাশ শতাংশ। অন্যদিকে, দেশের দশ শতাংশ শ্রমশক্তি নিয়ে সংগঠিত ক্ষেত্রের অবদান ওই প্রায় পঞ্চাশ শতাংশ। এ শুধু ভারতের গল্প নয়। একই কাহিনির পটভূমি থেকেছে তৃতীয় বিশ্বের বিস্তৃত অঞ্চল। অন্যদিকে, বিশ্বের যে-সব দেশে জাতীয় আয়ে ঊর্ধ্বগতি লক্ষিত হয়েছে, বিপুল শিল্পায়ন ঘটেছে, দেশ স্বল্পোন্নত থেকে উন্নত পর্যায়ে পৌঁছেছে, সেই সমস্ত দেশে অর্থব্যবস্থা ধনতান্ত্রিক হোক চাই সমাজতান্ত্রিক, গৃহীত হয়েছে পুঁজিনিবিড় প্রযুক্তি। কোথাও বাজারের কার্যকারণ পদ্ধতিতে, কোথাও পরিকল্পনার মাধ্যমে। ইংল্যান্ডের শিল্পবিপ্লবের প্রেক্ষাপট ছিল সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা ভেঙে পড়া, গ্রাম থেকে, কৃষিক্ষেত্র থেকে দলে দলে মানুষের শহরে আগমন এবং কল-কারখানায় মজুর হিসাবে কাজ করা। ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, জার্মানি, জাপান, আমেরিকা, এককালের সোভিয়েত রাশিয়া, ইদানীংকালের চীন – সর্বত্র প্রাধান্য পেয়েছে শিল্পায়ন এবং পুঁজিনিবিড় প্রযুক্তি। বিশেষ করে লক্ষ করার ক্ষেত্র হল প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকালীন সোভিয়েত রাশিয়া। কয়েকটি গবেষণায় ১৯২৮ সালের রাশিয়াকে বলা হচ্ছে labour surplus economy! রাশিয়া, শ্রমোদ্বৃত্ত অর্থনীতি! রাশিয়ার প্রসঙ্গে বলা হয়, প্রকৃত অর্থে শিল্পবিপ্লব ঘটে সোভিয়েত রাশিয়ায়, স্ট্যালিনের নেতৃত্বে, সূত্রপাত প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সময়ে। সময়সীমা ১৯২৮-১৯৩৩। মোটামুটি এই সময়েই পুঁজিতান্ত্রিক বিশ্বজুড়ে চলছে ঘোর মন্দা। অথচ, রাশিয়ায় শিল্পোৎপাদন সর্বস্তরে সর্বরকমে বেড়ে চলেছে। পরবর্তী পরিকল্পনাগুলিতে গতি আরও ত্বরান্বিত হয়েছে। কীভাবে? পুঁজি-শ্রম অনুপাত ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়েছে। এই বৃদ্ধি ঘটেছে সোভিয়েত রাশিয়ায় শ্রমশক্তি বিপুল হারে বৃদ্ধি পাওয়া সত্ত্বেও। কেন শ্রমশক্তি বৃদ্ধি পেয়েছে? গ্রামাঞ্চলে কৃষিকর্ম ও খামারের রাষ্ট্রের অধীনে কালেক্টিভাইজেশনের জেরে বহু কৃষক গ্রাম ছেড়ে পালিয়েছেন শহরে। অসংখ্য লেবার ক্যাম্পে বন্দি অগণন মানুষকে দিয়ে বলপূর্বক শ্রমদান করানো হয়েছে। শ্রমোৎপাদিত উদ্বৃত্তে পুঁজির পরিমাণ বেড়ে উঠেছে। এবং, ১৯৩২-৩৩ সালে সোভিয়েত রাশিয়ায় নেমে আসে দুর্ভিক্ষ। ইউক্রেন, যাকে বলা হত সোভিয়েত রাশিয়ার ব্রেড বাস্কেট, সেখানেই দেখা দেয় Holodomor, ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষ। এর কারণ, ইউক্রেনে উৎপাদিত প্রায় সমস্ত ফসল রাষ্ট্র উঠিয়ে নিয়ে যায় সৈন্যবাহিনীকে খাওয়াতে এবং শিল্পক্ষেত্রে

শ্রমিকদের পারিশ্রমিক দিতে। এর তুলনা পাওয়া যায় ইংল্যান্ডের শিল্পায়নের ক্ষেত্রেও। যদিও পদ্ধতিটি কিছুটা আলাদা। অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতকে শিল্পক্ষেত্রের শ্রমিকদের খাইয়ে বাঁচিয়ে রাখতে প্রয়োজনে সস্তায় খাদ্যশস্য রফতানির পক্ষে সওয়াল করেন শিল্পপতি, তাঁদের মুখপাত্র এবং তৎকালীন অর্থনীতিবিদ ও সমাজবিজ্ঞানীরা, যার প্রমাণ ধরা আছে বিখ্যাত Corn Law Controversy-তে। এই নিরিখে, সোভিয়েত রাশিয়া ইউক্রেন ইত্যাদি অঞ্চলগুলিকে একধরণের উপনিবেশ হিসাবে ব্যবহার করেছে বললে খুব ভুল বোধহয় হয় না। প্রসঙ্গত, প্রায় একই কারণে, ঘটে আমেরিকার গৃহযুদ্ধ। উনবিংশ শতকের শেষার্ধ। আমেরিকার উত্তরাংশ শিল্পোন্নয়নে তুলনায় এগিয়ে। দক্ষিণাংশ মূলত কৃষিনির্ভর। কিন্তু, দক্ষিণাংশে আছে বিস্তর খনিজ সম্পদ। আর আছে কালো দাসশ্রমিক। শিল্পোন্নয়নের জন্য প্রয়োজন দুটোই, খনিজ সম্পদ এবং সস্তা শ্রম। সুতরাং, শিল্পে অগ্রগতির খাতিরে উত্তরের ইয়াংকিদের নজর দক্ষিণে মজুত চল্লিশ লক্ষ ক্রীতদাসের উপর। চল্লিশ লক্ষ সস্তা শ্রমিক! কৃষিখামারের মালিকদের কাছ থেকে ছিনিয়ে এনে কারখানায় কাজে লাগাতে গেলে দক্ষিণের খামার-মালিকদের দাসত্ব থেকে তাদের মুক্ত করতে হবে। আইন করে বিলোপ করতে হবে দাসপ্রথা। হলও তা-ই। দক্ষিণ মানতে নারাজ। ফল, গৃহযুদ্ধ। ফিরে আসি সোভিয়েত প্রসঙ্গে। ১৯৩০-এর দশকের সোভিয়েত রাশিয়ার উন্নয়ন বলতে বোঝায় শিল্পের পাশাপাশি কৃষিক্ষেত্রেও প্রযুক্তিগত আমূল পরিবর্তন, ক্রমবর্ধমান পুঁজিনিবিড় প্রযুক্তি ব্যবহার, বেগার শ্রম এবং পুঁজির বৃদ্ধি। এবং, অবশ্যই মানুষের মৃত্যু, যার নির্ভরযোগ্য হিসাব কোথাও নেই। এই গায়ের জোরে শিল্পায়ন এবং বেগার শ্রম ইওরোপ, আমেরিকা এবং অন্যত্র যেখানে গণতান্ত্রিক ও ধনতান্ত্রিক শাসন ও সমাজব্যবস্থা বর্তমান সেখানে তখন আর সম্ভব নয়। এর অর্থ, সেসব দেশেও এ জিনিস অভূতপূর্ব নয়। বরং, খুবই ভূতপূর্ব। কিন্তু ভূতপূর্বই। সেসব দেশে এই কাণ্ড, তাকে অবিচার, অন্যায়, অমানবিকতা, পাশবিকতা, যা-ই বলা হোক, ঘটে গেছে উনবিংশ শতকের মধ্যে। সোভিয়েতের পদ্ধতি পরবর্তীকালে সমাজতান্ত্রিক চীন দৃঢ়তর নিষ্ঠা ও প্রতিজ্ঞায় এবং প্রবলতর গতিতে অনুসরণ করেছে। সম্ভবত, আজও করে চলেছে। মনে হওয়া অস্বাভাবিক নয়, চীনা কম্যুনিস্ট পার্টি আসলে একটা পুঁজিবাদী কর্পোরেট দৈত্য। মোটের উপর, এগিয়ে থাকা দেশগুলি করোনার মুখে দাঁড়িয়েও পুঁজিনিবিড় প্রযুক্তিকেই হাতিয়ার করছে।

চলে আসে ঔপনিবেশিক শাসনের প্রসঙ্গ। বিভিন্ন দেশ যারা একসময় ইওরোপীয় শক্তির উপনিবেশে পরিণত হয়েছিল তাদের অভিজ্ঞতা বেশ জটিল। যেমন, ভারত। বিভিন্ন গবেষণায় বলা

হচ্ছে, প্রাক-ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষ অর্থনৈতিকভাবে রীতিমতো উন্নত ছিল। মিশর, বর্মা, নাইজেরিয়া, শ্রীলঙ্কা, সুদান, উগান্ডা, এই দেশগুলিও ছিল উন্নত। অন্যদিকে, আমেরিকা, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, এসব দেশ ছিল অত্যন্ত অনুন্নত। মুঘল ভারতবর্ষ এবং গ্রেট ব্রিটেনের তুলনা করে দেখানো হচ্ছে, সপ্তদশ শতকের মধ্যভাগেও ভারতের মাথাপিছু আয় ছিল ব্রিটেনের মাথাপিছু আয়ের অন্তত ষাট শতাংশ। কৃষি ও শিল্পক্ষেত্রের তুলনাতেও ভারত খুব পিছিয়ে ছিল না। কিন্তু, ভারতের মতো দেশগুলি ঔপনিবেশিক শাসনের অধীন হওয়ার পর চিত্র দ্রুত বদলাতে থাকে। অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগ থেকে ভারত ক্রমাগত পিছিয়ে পড়তে থাকে। কারণ? ব্রিটিশ শাসন ও ব্রিটিশ স্বার্থ। এক) ব্রিটিশরা ভারতে নিজেদের বসতি স্থাপন করতে আসেনি। ভারতের উন্নয়নে তাদের স্বার্থ ছিল না। ভারতের অর্থনৈতিক উন্নতির চেষ্টাই তারা করেনি। অন্যদিকে, আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড ইত্যাদি দেশে ইওরোপীয়রা বিশেষত, ইংরেজ, স্কটিশ, আইরিশ এবং জার্মানরা বসতি স্থাপন করেছে। নিজেদের স্বার্থেই তারা ইওরোপীয় শিল্পবিপ্লব এবং শিল্পায়ন পদ্ধতি অনুসরণ করেছে। এইসব দেশের উন্নয়নকে ইওরোপ প্রকারান্তরে সমর্থন করেছে; দুই) ব্রিটিশ বাণিজ্য ও অর্থনীতির স্বার্থে ভারতে অবশিল্পায়ন ঘটেছে। ভারতীয় শিল্প ও বাণিজ্যকে ধ্বংস করে ব্রিটিশ নিজের শিল্প-বাণিজ্য প্রতিস্থাপন করেছে। ভারত পরিণত হয়েছে একদিকে সস্তা শ্রমিক ও কাঁচামালের জোগানদারে, অন্যদিকে ব্রিটিশ শিল্পোৎপাদনের বাজারে।

মোটের উপর, ভারত ব্রিটেনের উপনিবেশে পরিণত না হলে এদেশের অর্থনৈতিক গতিপ্রকৃতি কী হত আজ বলার উপায় নেই। এখানেও কি শিল্পবিপ্লব ঘটত? গ্রাম থেকে শহরে মানুষের পরিযাণ হত? সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার পতন ও কৃষিক্ষেত্রে এতটাই দুরবস্থা দেখা দিত যে, গ্রামের মানুষ শহরে শুধুমাত্র কোনওরকমে জীবনধারণের উপযুক্ত মজুরির বিনিময়ে কারখানার কাজে আগ্রহী হত? অস্বাস্থ্যকর শহুরে বস্তিতে বাস করত? এদেশের কোনও টমাস ম্যালথাস, জেম্স মিল, ডেভিড রিকার্ডো কিংবা ফার্দিনান্দ লেসাল কি সস্তা শ্রম তথা কেবলমাত্র বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় ন্যূনতম মজুরির পক্ষে উপস্থাপন করতেন 'আয়রন ল অফ ওয়েজেস'-এর মতো কোনও তত্ত্ব? জানার উপায় নেই। ১৯৪৪ সালে উঠতি ভারতীয় শিল্পপতি ঘনশ্যাম দাস বিড়লা The Annals of the American Academy of Political and Social Science পত্রিকায় লিখছেন, "Judged by whatever standards, one cannot escape the conclusion that India witnesses the pathetic sight that while millions and millions of her

people are underfed and under-clothed and are without shelter, there are large productive resources which remain unused, unemployed, or underemployed.” কী ব্যাখ্যা করবেন! দেশীয় পুঁজিপতির ছদ্ম সমবেদনা? দেশীয় পুঁজিপতির আক্ষেপ? হতে পারে। সেটাই হয়তো আসল। প্রসঙ্গত, এর প্রায় চল্লিশ বছর পরে, ১৯৮১ সালে, ১৯৪৩ সালের অবিভক্ত বাংলায় দুর্ভিক্ষের বিষয়ে অমর্ত্য সেন বলছেন, “... the disastrous Bengal famine was not the reflection of a remarkable overall shortage of foodgrains in Bengal.” অর্থাৎ, খাদ্যশস্যের অভাবে দুর্ভিক্ষ ঘটেনি। মূল কারণ অমর্ত্য সেনের কথায়, “... failures of exchange entitlement”। বিশেষত গ্রামীণ খেতমজুরদের মজুরির তুলনায় অন্যান্য পেশায় বিশেষত শহরে পারিশ্রমিক বেড়েছে, খাদ্যশস্যের দাম বেড়েছে, খেতমজুরদের প্রকৃত আয় তথা ক্রয়ক্ষমতা কমেছে। খাদ্য থাকা সত্ত্বেও মানুষের খাবার জুটছে না। কারণ? মূলত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, খাপছাড়া শিল্পায়ন, মজুতদারি ও কালোবাজারি। পাশাপাশি, রাখা যাক জি ডি বিড়লার বক্তব্য। ১৯৪৪ সালে পূর্বোক্ত প্রবন্ধেই তিনি আরও বলছেন, “The per capita production of such vital guides to industrial progress as iron, steel, and coal in India is .005, .003, and .007 ton respectively, as against .3, .4, and 3 tons in the United States, and .2, .3, and 5.2 tons in the United Kingdom.” ভদ্রলোক খবর রাখেন।

এর কয়েক বছর পর দেশ স্বাধীন হল। কী করলেন কর্তারা? বিশ্বের ইতিহাস দেখলেন। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা থেকে দ্রুত শিল্পায়নের পরিকল্পনা গ্রহণ করলেন। ভারী শিল্প বেশিটাই রাষ্ট্র নিজেই উৎপাদন করবে স্থির হল। পরিকল্পনা হল আংশিক সরাসরি রাষ্ট্রের অধীনে, আংশিক রাষ্ট্রের নির্দেশমতো অর্থনৈতিক কাজকর্ম ও উৎপাদন চলবে। সবেতেই নিয়ন্ত্রণ থাকবে রাষ্ট্রের। ক্রমে প্রভূত উৎপাদনের উপাদান, উৎপাদনী ক্ষেত্র, আর্থিক ক্ষেত্র ইত্যাদি রাষ্ট্রায়ত্ত হল। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার বিরুদ্ধে বহু সমালোচনা আছে। কিন্তু, পরিকল্পনার ফলে কোনও লাভ হয়নি এটা বলা বাড়াবাড়ি। স্বাধীনতার পর দেশের সার্বিক পরিকাঠামো যেটুকু তৈরি হয়েছে তার বেশিটাই সম্ভব হয়েছে রাষ্ট্রের উদ্যোগের ফলে। কিন্তু, আমাদের দেশ গণতান্ত্রিক। গণতন্ত্রের অনেক সুফল আছে। অমর্ত্য সেন সযুক্তি বক্তব্য রেখেছেন, “... while India continued to have famines under British rule right up to independence ... they disappeared suddenly with the establishment of a multiparty democracy and a free

press.” আবার আপাতদৃষ্টিতে গণতন্ত্রের কিছু সমস্যাও আছে। ভারতের দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় প্রভাব ছিল সোভিয়েত পরিকল্পনার অভিজ্ঞতা ও প্রদর্শনীর। সোভিয়েত রাশিয়া প্রথম থেকেই কীভাবে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা রূপায়ণ করেছে তার উল্লেখ আগে করা হয়েছে। বলা বাহুল্য, স্বাধীন ভারতীয় গণতন্ত্রে স্বাধীন সংবাদমাধ্যমের উপস্থিতিতে তেমন কারবার সম্ভবই নয়। সঞ্জয় ও ইন্দিরা গান্ধী এমারজেন্সি ঘোষণা করে একটা কিছু করতে চেয়েছিলেন। সেই প্রচেষ্টাকে বিন্দুমাত্র সমর্থন না করেও বলা যায়, তাঁরা মোটামুটি তার মূল্য চুকিয়ে গেছেন। সংসদীয় গণতন্ত্রে নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার বদলায়। ভোটের রাজনীতি ভাল-মন্দের বিচার অনেক সময়ই গুলিয়ে দেয়। বিভিন্ন দলের দৃষ্টিভঙ্গি, প্রতিশ্রুতি, ইস্তাহার ইত্যাদিও আলাদা। একটি পরিকল্পনা চলাকালীন সরকার বদলে গেলে পরিকল্পনার গতিপ্রকৃতিও বদলে যেতে পারে। পরবর্তী পরিকল্পনা পূর্ববর্তীটির সঙ্গে আগাগোড়া অসমঞ্জসও হতে পারে। নীতি রূপায়ণের ক্ষেত্রে কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে সমন্বয় সাধনের সমস্যাও থাকে। কিন্তু, আশির দশক অবধি বিভিন্ন সরকার এলে-গেলেও পূর্ণ মহিমায় রয়ে গিয়েছিল লাইসেন্স রাজ নামে সরকারি নিয়ন্ত্রণটি। নব্বইয়ের দশকে সেও গেল। এসে পড়ল উদারীকরণ, বেসরকারিকরণ ও বিশ্বায়ন। বিশ্বের বেশিরভাগ সমাজতান্ত্রিক শাসনাধীন দেশেই সমাজতন্ত্র ভেঙে পড়ল। দাঁড়িয়ে আছি ২০২০-তে, ঘরবন্দি, দেখছি করোনাকে। অষ্টাদশ-উনবিংশ শতকের সেই প্রথম শিল্পবিপ্লবের পরে ইতিমধ্যে না কি বিশ্ব দেখে ফেলেছে আরও তিনটে শিল্পবিপ্লব। প্রথম শিল্পবিপ্লবে মূল চালিকাশক্তি ছিল জল ও বাষ্পশক্তি। দ্বিতীয়টিতে বিদ্যুত। তৃতীয়টিতে বৈদ্যুতিন ব্যবস্থা ও তথ্যপ্রযুক্তি। এই তৃতীয় বিপ্লবের উপরে ভর করেই চতুর্থ শিল্পবিপ্লব বর্তমানে ঘটমান। আমাদের অস্তিত্বের প্রায় সর্বত্র ছেয়ে যাবে ডিজিটাল প্রযুক্তিতে। এর ফলে, সমাজনীতি, রাষ্ট্রনীতি, জ্ঞান, বিজ্ঞান, সংস্কৃতি প্রভৃতির পাশাপাশি বদলাবে অর্থনীতিও। অর্থনৈতিক বৈষম্য বেড়ে ওঠার সম্ভাবনাও থাকে। বৈষম্য রোধ করা এবং কমানোর কৌশল ও নীতিও তাই উদ্ভাবন করা প্রয়োজন। সতর্ক থাকা দরকার এই সুযোগে প্রশাসন যেন স্বেচ্ছাচারী অগণতান্ত্রিক হয়ে না ওঠে।

গত বাহাত্তর বছরে দেশে বলার মতো একটা কৃষিনীতি নেই, শিল্পনীতি নেই, কৃষি ও শিল্পের সমন্বয়, মেলবন্ধন বা, ভারসাম্যের খাতিরে একটা সংযুত নীতি নেই। এখানেই চলে আসে ভারতের অসংগঠিত ক্ষেত্র, ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক বৈষম্য এবং হ্যাঁ, পরিযায়ী শ্রমিকের প্রসঙ্গ। বলা বাহুল্য কি না নিশ্চিত নই, অসংগঠিত ক্ষেত্রের সমস্যা, অর্থনৈতিক বৈষম্য এবং পরিযায়ী শ্রমিক, এই তিন বিষয়ের কোনওটাই ভারতে নতুন নয়। গত শতকের অন্তত আশির দশক থেকে এই তিনটি ঘটনাই বাড়তে থেকেছে।

পরিযায়ী শ্রমিকের বিষয়টা বোঝা দরকার। আজ সকলেই সংবাদমাধ্যমের খবরে ছবিতে পরিযায়ী শ্রমিক চেনেন। চর্চা হচ্ছে প্রচুর। অথচ, এরা ছিলেন। বরাবর ছিলেন। কিন্তু, বরাবর আলোচিত হননি, সংবাদমাধ্যমের শিরোনামে আসা দূরের কথা। আজ তাঁদের স্বদেশাভিমুখী দীর্ঘ যাত্রা, পথেই মৃত্যু, পথশ্রম, সরকারের উদাসীনতা ইত্যাদি দেখে আমরা ক্রুদ্ধ, বিরক্ত। বারংবার প্রশ্ন তুলছি এদের কথা আগে ভাবা হয়নি কেন? এদের জন্য পরিবহনের ব্যবস্থা কোথায়? পথে আশ্রয় এবং খাবার ও জলের বন্দোবস্ত কেন অমিল? পশুর মতো ব্যবহার কেন করা হচ্ছে? সর্বাঙ্গে স্যানিটাইজার নামে কোনও তরল ছেটানো হচ্ছে যেন এরা মানুষ নন। কেন?

উত্তর খুব সহজ। আমাদের সামগ্রিক অজ্ঞতা, অনবধান, ঔদাসীন্য এবং উপেক্ষার প্রেক্ষাপটে এঁদের দীর্ঘ ইতিহাস এঁদেরকে এই জায়গাতেই এনে ফেলেছে। সমাজ ও সরকারের চোখে এঁদের পাওনা ওটাই। একে অন্যায় বলুন, অবিচার, পাশবিক, যা-ই বলুন, এটাই সত্যি। আজ খবরে ছবিতে জেনে কিছু কথা বলছি। প্রশ্ন করছি। কখনও এত অধীর উদ্বিগ্ন হয়ে প্রশ্ন করেছি, এঁরা কর্মসূত্রে যেখানে থাকেন সেখানে কোন পরিবেশে বাস করেন? কীভাবে নিয়মিত পুলিস ও প্রশাসনের হাতে লাঞ্ছিত নিগৃহীত হন? ভিনরাজ্যে কোথায় কী কাজ করেন? কত রোজগার করেন? সর্বোপরি, এঁরা কেন নিজের জন্মভূমি, পৈতৃক বাসস্থান ছেড়ে ভিনরাজ্যে যান? আসলে, অষ্টাদশ-উনবিংশ শতকের ইংল্যান্ড, আমেরিকা কিংবা, বিংশ শতকের প্রথমার্ধের সোভিয়েত রাশিয়ার শ্রমিকদের মতোই ব্যবহার পেয়ে এসেছেন, পাচ্ছেন স্বাধীনতা পরবর্তী ভারতের পরিযায়ী শ্রমিকদল। কিছু তফাতও আছে।

বিভিন্ন সূত্র অনুযায়ী, ২০১৬ সালে ভারতে পরিযায়ী শ্রমিকদের মোট সংখ্যা প্রায় দশ কোটি অর্থাৎ দেশের মোট শ্রমশক্তির প্রায় কুড়ি শতাংশ। পরিযায়ী শ্রমিকদের মোটা দাগে দুটি ভাগ। এক) যাঁরা বিশেষ মরসুমে নিজ বাসভূমি ছেড়ে দেশের বা রাজ্যের ভিন্নস্থানে যান এবং মরসুমের শেষে বাড়ি ফেরেন। এরা পাখির মতোই পরিযায়ী। মূলত কৃষিকাজে পারদর্শী। নির্দিষ্ট মরসুমটিতে এলাকায় কাজ নেই বা, প্রত্যাশিত মজুরি মেলে না বলে অন্য জায়গায় কাজে যান। কাজের মরসুম শেষ হয়ে গেলে নিজের এলাকায় ফেরেন। ভারতে এই ধরণের পরিযায়ী শ্রমিকের সংখ্যা প্রায় এক কোটি কুড়ি লক্ষ; দুই) দ্বিতীয় ধরণের পরিযায়ী শ্রমিকদের পরিযায়ী না বলে প্রবাসী শ্রমিক বলা হয়তো ভাল। এরা পাকাপাকি কাজের খোঁজেই অন্যত্র যান। ইতিমধ্যে প্রদত্ত সংখ্যাগুলি দেখে বোঝা যায় পরিযায়ী শ্রমিকদের মধ্যে এদের সংখ্যাই বেশি। দুই ধরণের পরিযায়ী শ্রমিকদের মধ্যেই আছেন এক) কাজের খোঁজে নিজের রাজ্যেই এক জেলা থেকে আর এক জেলায় যান, দুই) নিজের রাজ্যেরই গ্রাম থেকে শহরে যান এবং, তিন) নিজের রাজ্য থেকে ভিনরাজ্যে যান।

আলোচনা তৃতীয় ধরণের অর্থাৎ, আন্তঃরাজ্য পরিযায়ী শ্রমিকদের বিষয়েই সীমাবদ্ধ থাকবে। বিভিন্ন সূত্রের হিসাব অনুযায়ী, ভারতে এমন শ্রমিকের সংখ্যা আনুমানিক এক কোটি কুড়ি লক্ষ থেকে এক কোটি আশি লক্ষের মধ্যে। প্রথম প্রশ্ন, ভারতের কোন রাজ্যগুলি থেকে ভিনরাজ্যমুখী শ্রমিকের সংখ্যা অধিক? ২০১১ সালের আদমশুমারি আনুযায়ী, সংখ্যার নিরিখে ক্রমানুসারে সাজালে, ১) উত্তরপ্রদেশ; ২) বিহার; ৩) রাজস্থান এবং ৪) পশ্চিমবঙ্গ। এদের পরে আসে মধ্যপ্রদেশ, ঝাড়খণ্ড, ছত্তিসগড়, ওড়িশা প্রভৃতি রাজ্য। অর্থাৎ, পরিযায়ী শ্রমিকেরা মূলত আসেন শিল্পায়নের ক্ষেত্রে পিছিয়ে থাকা রাজ্যগুলি থেকে। দ্বিতীয় প্রশ্ন, ভারতের কোন রাজ্যগুলিতে ভিনরাজ্যের শ্রমিকের ঢল বেশি? মহারাষ্ট্র, দিল্লি, গুজরাত, তামিলনাড়ু এবং কর্নাটক। অর্থাৎ, যে রাজ্যগুলি শিল্পায়ন ও নগরায়নের ক্ষেত্রে তুলনায় অগ্রসর এবং দেশের জাতীয় আয়ে যাদের অবদান বেশি। তৃতীয় প্রশ্ন, পরিযায়ী শ্রমিকেরা কী পরিমাণ রোজগার করেন? বাইশ শতাংশের রোজগার মাসে দু'হাজার টাকার কম; বত্রিশ শতাংশের দুই থেকে পাঁচ হাজারের মধ্যে; পঁচিশ শতাংশের পাঁচ থেকে দশ হাজারের মধ্যে; তেরো শতাংশের দশ থেকে কুড়ি হাজার; আট শতাংশ রোজগার করেন মাসে কুড়ি হাজার টাকার বেশি। অর্থাৎ, ভিনরাজ্যে গিয়ে এরা বড়লোক হন না। চতুর্থ প্রশ্ন, ভিনরাজ্যগুলিতে এরা কী ধরণের কাজ করেন? প্রায় সব ধরণের। রিকশা চালানো, রাস্তায় খাবারের দোকান দেওয়া, দোকানে কাজ করা, দর্জির কাজ, জঞ্জাল সাফাই, মুটেগিরি, গয়নার কারখানায় কাজ, খাবার ডেলিভারি, অনলাইন সংস্থার মাল ডেলিভারি, গ্যারাজ মিস্ত্রির কাজ, নির্মাণকাজ ইত্যাদি থেকে শুরু করে বড় কারখানায় শ্রমিকের কাজ। অর্থাৎ, এমন নয় যে, তাঁরা শুধু বৃহৎ শিল্পের কারখানায় কাজ করেন। বরং, উল্টোটাই সত্যি। এই শ্রমিকেরা মূলত অসংগঠিত। শিল্পে নিযুক্তরা বেশিরভাগই কাজ করেন ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগে। পঞ্চম প্রশ্ন, তাহলে, এই রাজ্যগুলি শিল্পোন্নত হওয়ার বিশেষত, বৃহৎ শিল্পের কী গুরুত্ব তাঁদের কাজ পাওয়ার ক্ষেত্রে? বৃহৎ শিল্পের সঙ্গে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের যোগসূত্র। বৃহৎ শিল্প থাকলে চাহিদা থাকে জোগান শৃঙ্খলের, সাপ্লাই লজিস্টিক্সের। বৃহৎ শিল্পের এবং বৃহৎ শিল্পে নিযুক্ত কর্মীদের আরও বহু প্রকার চাহিদা থাকে। এমনকী, একজন ফুচকা, ভেলপুরি, পাওভাজি, চপ, ল্যাংচা বিক্রেতার বিক্রিবাটা বা, হোম ডেলিভারি সংস্থার এক ডেলিভারি বয়ের রোজগার বা, একজন নির্মাণকর্মীর আয় খুব গুরুত্বপূর্ণভাবে সম্পর্কিত হতে পারে একটি বৃহৎ শিল্পোদ্যোগের সঙ্গে। নিজের রাজ্যে এই পরিস্থিতি নেই, সেখানে কাজ নেই বলেই এরা আসেন ভিনরাজ্যে। তাতে কি বলা যায়, নিজের রাজ্যে এরা উদ্বৃত্ত!

মনে পড়ে একটি গল্প – Parable of the Prodigal Son। ক্ষমা করবেন। পরিযায়ী শ্রমিকদের ক্ষেত্রে সর্বতো সুপ্রযুক্ত নয় কাহিনিটি। পরিযায়ী শ্রমিকেরা প্রডিগাল নন। তাঁরা পৈতৃক সম্পত্তি দু'হাতে ওড়াতে ভিনরাজ্যে যাননি। বরং, জন্মভূমিতে রোজগার জোটেনি বলেই গিয়েছেন। তবু, কাহিনিটির একটুকু প্রাসঙ্গিকতা এই আলোচনার ক্ষেত্রে হয়তো আছে। গল্পটি সকলেই জানেন। তবুও সংক্ষেপে – এক দেশে এক কৃষকের ছিল দুই সন্তান। ছোটটি একদিন পিতাকে বলে, পারিবারিক সম্পত্তির যেটুকু অংশ আমার প্রাপ্য আমাকে এখনই দাও। পিতা দিয়েও দেন। পুত্র বিদেশে গিয়ে জীবন যথেচ্ছ উপভোগ করে এবং পিতৃদত্ত সমস্ত সম্পদ খরচ করে ফেলে। শেষপর্যন্ত বাঁচার তাগিদে দেশে পিতার কাছে ফিরে আসে। পিতা তাকে বকাঝকা করেন না। বরং, খুশি হয়ে বুকে জড়িয়ে ধরেন। উৎসবের আয়োজন করেন। জ্যেষ্ঠপুত্র রেগে বলে, আমি তোমাকে ছেড়ে কোথাও যাইনি, নিজেদের জমিতে উদয়াস্ত কাজ করেছি। আমার হাতে অতিরিক্ত দু'পয়সা কখনও তুলে দাওনি। অথচ আজ কনিষ্ঠপুত্রের অভ্যর্থনায় এত আয়োজন! পিতা বলেন, রাগ কোর না। তুমি তো প্রাপ্য সবই পাবে। কিন্তু তোমার ছোটভাই আজ আমাদের মাঝে ফিরে এসেছে – he was lost and now he is found! ব্যস্, এইটুকুই, গল্পের এইটুকুই আমাদের আলোচনায় প্রাসঙ্গিক। এই পিতার কর্তব্যই রাষ্ট্রের বা সরকারের কর্তব্য। না কেন্দ্রে, না রাজ্যে এই কর্তব্য পালিত হয়েছে। পালিত হয়নি বলেই মানুষকে কাজের খোঁজে যেতে হয়েছে রাজ্যের বাইরে। কর্তব্য পালিত হয়নি বলেই তাঁরা জন্মভূমিতে ফিরতে পারেন না। Lost and found জমাখাতায় তাঁরা চালান হয়েছেন খরচের খাতে। আজ যখন লকডাউনে কর্মহীন হয়ে, রোজগার হারিয়ে ফিরতে চাইছেন, পদে পদে সম্মুখীন হচ্ছেন হেনস্থার, লাঞ্ছনার, মৃত্যুর। পিতা-মাতা হাত বাড়িয়ে বুকে ডাকছেন না। সম্ভবত, ডাকতে পারছেন না। এমন অধম অক্ষম মাতা-পিতার গতি কী হওয়া উচিত? সে আর এক গল্প। থাক। আসলে, আমাদের দেশে মানুষ আজও শুধুমাত্র জনসংখ্যা। তাকে মানবসম্পদ হিসাবে দেখতে শিখিনি আমরা।

লকডাউনের আবহে খেয়ে-পরে এবং প্রয়োজনীয় চিকিৎসার আশ্রয়ে বাঁচতে গেলে অর্থনৈতিক কাজকর্ম চালু তো করতেই হবে, বৃহৎ ও পুঁজিনিবিড় শিল্পের সন্ধানেও শেষপর্যন্ত হাত বাড়াতে হবে। অন্যথা, কুটিরশিল্প এবং অতিক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পরাও বাঁচবে বলে মনে হয় না। উদ্বৃত্ত শ্রমের দেশে যে উদ্বৃত্ত পরিযায়ী শ্রমিকেরা ঘরে ফিরে এলেন তাঁরা রোজগারের সুযোগ পাবেন না। কাছের মানুষের কাছেও অবাঞ্ছিত পরজীবী গণ্য হবেন। এবং অবশ্যই, ডিজিটাল কারবার মেনে নিতে হবে। বিনাশর্তে কখনওই নয়। চোখকান বুজে তো নয়ই। কিন্তু, সতর্ক থেকেই অনলাইন-কে জীবনের অনেকটা জায়গায় বাধ্য হয়েই ঠাঁই দিতে হবে। ডিজিটাল পরিকাঠামো গড়ে তোলায়

সরকারকে উদ্যোগ নিতে হবে। এই প্রসঙ্গে শিক্ষাব্যবস্থার কথা স্বাভাবিকভাবেই এসে পড়ে। উৎপাদনের পতন রুখতে এবং আয়বৃদ্ধি ঘটাতে কি আমাদের আরও ডাক্তার, নার্স, ইঞ্জিনিয়ার, শিক্ষক, গবেষক, সাংবাদিক, হিসাববিশেষজ্ঞ, কমপিউটার-বিশেষজ্ঞ, তথ্যপ্রযুক্তিবিদ, শিক্ষিত দক্ষ শ্রমিক প্রভৃতির প্রয়োজন হবে না?

আজকের ছাত্রছাত্রী আগামীর মানবসম্পদ। তাদের লেখাপড়ায় ব্যয় হল বিনিয়োগ। লেখাপড়া বন্ধ থাকলে এই বিনিয়োগে ছেদ পড়ে। হিউম্যান ক্যাপিটাল গড়া বন্ধ হয়। ভবিষ্যতে অর্থনীতির অধোগতি নিশ্চিত হয়। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকলেও, পরিকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণের খরচ থাকে। সর্বস্তরে আয় কমলে, জাতীয় আয়বৃদ্ধির হার ঋণাত্মক হলে, সরকারি-বেসরকারি নির্বিশেষে কর্তৃপক্ষ হয়তো একসময় ভাববেন শিক্ষক-শিক্ষিকাদের কতদিন সবেতন বাড়িতে বসিয়ে রাখা যায়। অর্থাৎ, শিক্ষাব্যবস্থারও একাধিক গুরুতর অর্থনৈতিক মাত্রা আছে। সংক্রমণ এড়াতে লেখাপড়া অংশত ডিজিটাল মাধ্যমে চালাতে হবে।

অনলাইন লেখাপড়ায় সীমিত হলেও, প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাচর্চা স্রোতস্বিনী থাকে। ভগ্নাংশের হারে হলেও, বিদ্যা অধীত এবং অর্জিত হয়। নেই-রাজ্যের তুলনায় অনলাইন রাজ্য ভাল। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও শিক্ষকশিক্ষিকাদের থেকে বিচ্ছিন্ন ছাত্রছাত্রীদের অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়ার সম্ভাবনাও থাকে। অনলাইন লেখাপড়ার মাধ্যমে দৈনিক পাঠাভ্যাসে নিযুক্ত থেকে এই অবসাদের আক্রমণ থেকে কিছুটা মুক্তি ঘটতে পারে। অন্যদিকে, অনলাইন পঠনপাঠনের বিরুদ্ধে জোরালো যুক্তি, পদ্ধতিটি ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বৈষম্যের সৃষ্টি করে।

বিতর্কগুলিতে ব্যবহৃত হচ্ছে কিছু তথ্য যেমন, ভারতে মাত্র ২৭ শতাংশ পরিবারে কিছু সদস্যের ইন্টারনেট সংযোগ আছে। তাদেরও কেবল ৪৭ শতাংশ সদস্যের হাতে কমপিউটার বা স্মার্টফোন আছে। ছাত্রকুলের মাত্র ১২.৫ শতাংশের বাড়িতে ইন্টারনেট সংযোগ আছে। সেক্ষেত্রেও শহর ও গ্রামের মধ্যে বৈষম্য আছে। শহরে ছাত্রদের ২৭ শতাংশের এবং গ্রামাঞ্চলে ছাত্রদের মাত্র ৫ শতাংশের বাড়িতে ইন্টারনেট সংযোগ আছে, ইত্যাদি। প্রসঙ্গত, এই তথ্যগুলির সূত্র NSSO-এর ২০১৪ সালের একটি সমীক্ষা। আজ ২০২০। প্রযুক্তিগত বিস্তৃতির ক্ষেত্রে ছ'টা বছর দীর্ঘ সময়।

ছ'বছরে বহু প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে। জানা যাচ্ছে, ২০১৩ সালে ভারতে স্মার্টফোন ব্যবহারকারীর সংখ্যা ছিল চার কোটি। ২০১৯ সালে ৫০ কোটি ২২ লক্ষ। ২০১৯ সালে ভারতে সোস্যাল মিডিয়া ব্যাবহারকারী ৩১ কোটি। তাদের ৩৫ শতাংশেরই অর্থাৎ, প্রায় ১১ কোটি তরুণ-

তরুণীর বয়স ১৮-২৪, যে বয়সে মানুষ কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে। এদের মধ্যে শুধু ফেসবুক ব্যবহারকারীর সংখ্যা ৯ কোটি ৭২ লক্ষ। ২০১৪ সালে ভারতে ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা ২৩ কোটি ৩১ লক্ষ। ২০১৮ সালে ৫৬ কোটি ৬০ লক্ষ। বর্তমানে ভারতে ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা বিশ্বে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ। স্মার্টফোন পিছু ডেটা ব্যবহার (৯.৮ জিবি/মাস) বিশ্বে সর্বোচ্চ। ইন্টারনেট ব্যবহারকারীদের ৯৭ শতাংশ স্মার্টফোনের মাধ্যমে তা করেন। ২০১৮ থেকে ২০১৯ সালের মধ্যে গ্রামাঞ্চলে ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা ৩৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে।

কারণ? এক) দশ বছরে স্মার্টফোনের দাম গড়ে ১৬ শতাংশ কমেছে। কয়েকটি ব্র্যান্ড ও মডেলের ক্ষেত্রে আরও বেশি। ২০০৯ সালে প্রাথমিক বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন স্মার্টফোনের দাম ছিল ১২,০০০ টাকা। ২০১৮ সালে সেই গোত্রের ফোনের দাম ১৪০০ টাকা। ২০০৯-১০ সালে স্মার্টফোন বিক্রি হয়েছিল ২০ লক্ষ। ২০১৭-১৮ সালে ১১ কোটি ৭০ লক্ষ। দুই) ২০১৪ সালে ডেটার দাম ছিল গড়ে ২৬৯ টাকা প্রতি জিবি। ২০১৮ সালে গড়ে ১২ টাকা প্রতি জিবি।

AISHE-এর প্রতিবেদন অনুযায়ী, ২০১৮-১৯ বর্ষে ভারতে কলেজগুলির ৬১ শতাংশ গ্রামীণ এলাকায়। দেশে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় মিলিয়ে মোট ছাত্রসংখ্যা ৩ কোটি ৭৪ লক্ষ। মোট ১৮০টি পাঠক্রমের মোট ছাত্রছাত্রীর ৮০.৩ শতাংশ পাঠরত ১০টি পাঠক্রমে। ৫০ শতাংশ ছাত্রের বিষয়গুলি ল্যাবরেটরির সঙ্গে সম্পর্কহীন। জেনারেল ডিগ্রি কোর্সের বিএ ও বিকম পাঠরতরা বিএ, বিএসসি ও বিকম মিলিয়ে পাঠরতদের ৭৪ শতাংশ দাঁড়ায়। অনলাইন লেখাপড়া অন্তত এই ৭৪ শতাংশ ছাত্রছাত্রীর সম্পূর্ণ সিলেবাসের নিরিখে উপকারে আসার কথা। বিএসসি-তে পাঠরত ৩৬ শতাংশের উপকার আংশিক।

পাশাপাশি মনে করা যাক পূর্বে প্রদত্ত সোস্যাল মিডিয়া ব্যবহারকারীর সংখ্যা। ১৮-২৪ বয়ঃসীমায় মোট জনসংখ্যা ১৪ কোটি ২২ লক্ষ। এই বয়ঃসীমায় কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে মোট পড়ুয়ার সংখ্যা ৩ কোটি ৭৪ লক্ষ যা শুধু ফেসবুক ব্যবহারকারী ৯ কোটি ৭২ লক্ষের ৩৮ শতাংশ, মোট সোস্যাল মিডিয়া ব্যবহারকারী ১১ কোটির ৩৪ শতাংশ।

অনলাইন লেখাপড়া কখনওই সরাসরি শ্রেণিকক্ষের পঠনপাঠনের বিকল্প নয়। কিন্তু, তা কতদূর সীমাবদ্ধ এবং ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বৈষম্য আদতে কতটা বাড়াবে সে-বিষয়ে মতামত গুটিকয় প্রাচীন তথ্যসূত্রের উপরে নির্ভরশীল হলে তার গ্রহণযোগ্যতা প্রশ্নের মুখে পড়ে।

এর অর্থ এই নয় যে, পরিস্থিতি মনোরম, আর কিছু করার দরকার নেই। অবশ্যই সরকারের তরফে ইন্টারনেটের আরও জোরালো ও বিস্তৃত পরিকাঠামো গড়ে তোলা, দরিদ্র ছাত্রছাত্রীর কাছে নিখরচায়, প্রয়োজনে ভর্তুকিতে, ছাত্রবৃত্তির অঙ্গ হিসাবে হ্যান্ডসেট ও ডেটা প্যাক পৌঁছনোর ব্যবস্থা করা উচিত।

থাকে একটি প্রশ্ন – অনলাইন পঠনপাঠন সম্পূর্ণ বন্ধ রাখলে তা বরং বৈষম্য বাড়িয়ে তোলে কি না। ভারতে ধনীতম ১০ শতাংশ মানুষের হাতে দেশের মোট সম্পদের ৭৭ শতাংশ ঘনীভূত। তাদের মাত্র এক শতাংশ দেশের ৫২ শতাংশ সম্পদের মালিক। অন্যদিকে, দেশের ৬০ শতাংশ মানুষ দেশের মাত্র ৫ শতাংশ সম্পদের মালিক। দরিদ্রতম ১০ শতাংশের হাতে আছে মাত্র ০.২ শতাংশ সম্পদ। বিগত কয়েক দশকে চিত্র এই জায়গায় দাঁড়িয়েছে। অনলাইন পড়াশুনো বন্ধ রাখলে তাতে বিশেষ তরিতফাত ঘটবে না। বরং, শুধু সাধারণ ডিগ্রি কলেজগুলির ছাত্রছাত্রীরাও যতটুকু উপকার পেতে পারত তা পাবে না। অন্যদিকে, দেশে ও বিশ্বে সমস্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান অনলাইন পড়াশুনোর ব্যবস্থা বন্ধ করবে না, বন্ধ নেইও। অন্তত ওই ধনীতম ১০ শতাংশ পরিবারের সন্তানদের অনলাইন পড়াশুনো জারি থাকবে। এরা এগিয়ে যাবে। আখেরে বৈষম্য আরও বাড়বে। পিছনে পড়ে থাকবে যারা নীতিগত কারণে অনলাইন লেখাপড়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হল। এদের মধ্যে কিছু ছাত্রছাত্রীও যদি অনলাইন লেখাপড়ার সুযোগ পেত, বৈষম্য বৃদ্ধির হার কিছু কমই হত।

দেওয়ালের লিখন বোধহয় খুব অস্পষ্ট নয়। লকডাউন যদি দীর্ঘতর হয়, করোনা কিংবা, সমজাতীয় ভাইরাস ফিরে ফিরে আসে, স্বল্পকালীন লক্ষ্যে মূল কর্তব্যগুলি হওয়া উচিত সরকারি বাজেটে ব্যয়বৃদ্ধি, বাজেট ঘাটতি হলেও গরিবের হাতে নগদ অর্থপ্রদান এবং স্বাস্থ্য পরিকাঠামোয় বাড়তি বিনিয়োগ। দীর্ঘকালীন লক্ষ্যে কর্তব্য হওয়া উচিত আরও দ্রুত শিল্পায়ন, যেখানে সম্ভব ও প্রয়োজন পুঁজিনিবিড় প্রযুক্তি ব্যবহার, প্রযুক্তি নির্বিশেষে উৎপাদনশীলতা বাড়ানো, ডিজিটাল পরিকাঠামো গঠন, অনলাইন প্রযুক্তির ব্যবহার, অসংগঠিত শিল্পের মানোন্নয়ন এবং এই ক্ষেত্রকে দ্রুত সংগঠিত ক্ষেত্রে উত্তীর্ণ হতে সাহায্য করা, কৃষি ও শিল্পনীতির মধ্যে সামঞ্জস্য আনা এবং সমন্বয় সাধন করা। মানুষকে জনসংখ্যা ভাবলে চলবে না। মানবসম্পদের মর্যাদা দিতে হবে।

এই সমস্ত কর্তব্য পালিত না হলে, পিতা-মাতার চোখের সামনেই জ্যেষ্ঠ-কনিষ্ঠ সকল সন্তানই পথে বসবেন। পিতা-মাতাও অস্তিত্বহীন হবেন। Lost and found জমাখাতা বন্ধ করে যাওয়ার বেলা জেনে যেতে হবে, অল ইজ লস্ট।